কলম্বাসের স্বপ্ন-ভারত, দমিনিকান রিপাবলিক

প্রীতি সান্যাল

কলম্বাস স্বপ্ন দেখতেন একদিন জাহাজ ভাসিয়ে সোনা মাণিক্যের দেশ ভারতে পৌঁছবেন, উড়বে স্পেনের রাজপতাকা। গড়ে উঠবে হিসপানিয়োলা, ক্ষুদে স্পেন। কত দেশে নেমে ভেবেছেন এই সেই সোনার দেশ, নাম দিয়েছেন ইন্ডিয়া, মানুষজনেরা ইন্ডিয়ান। লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান সাগরে অনেক দ্বীপ এই ভুলেই স্প্যানিশ উপনিবেশ হয়ে ওঠে। পরে দেশগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত আর তা লিখতেন দিনপঞ্জিতে। অ্যান্টিইস, ওয়েস্টইন্ডিজ ক্যারিবিয়ান - তিনটি নাম একই মাটির, দ্বীপগুলি আটলান্টিক ক্যারিবিয়ান সাগর ঘিরে ও ঘুরে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার কাছে বাঁক নিয়েছে যেন। এ রকম কয়েকটি দ্বীপে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। এবার দমিনিকান রিপাব্লিক দ্বীপে চলেছি। কলম্বাসের লেখায় "মানুষের চোখ এত সুন্দর দ্বীপকে এর আগে কখনও ছোঁয়নি "।

টেলিফোনে ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদককে জানালাম আসন্ন গন্তব্য দেশের কথা। তিনি পারলে এখনই সেই দ্বীপমুখী হবার বাসনা প্রকাশ করলেন। ইওরোপের কোনও কনফারেন্সে ছবির বই উপহার পান সেখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণও। ছবি চোখ ও মন দুই টেনেছে তাঁর। একদিন তিনি আসবেনই তবে এখন আমাকে অনুরোধ জানালেন উড়োজাহাজে উঠেই যেন লিখতে শুরু করি এ দ্বীপটিকে নিয়ে। রাজধানীর নাম সান্তা দমিনিকা। অনেকের মতো আমারও মনে হয়েছিল পুরো দেশটার নামই তাই। দমিনিকান রিপাবি- ক দ্বীপটির উত্তরে আটলান্টিকের বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে, ভ্রমণবিলাসীদের ভিড় সেখানেই। দক্ষিণে ক্যারাবিয়ান সাগরের কোলে সান্তা দমিনিকা রাজধানী। এর উত্তর পশ্চিমে বাহামা, মেক্সিকো উপসাগর, মিয়ামি হাভানা, নীচে পানামা, গুয়েতামালা কারাকাস এবং পুবে একসাথে যুক্ত ও বিভক্ত হাইতি, একটু দুরে পর্তুরিকো। দুই সাগরের মাঝে ভেসে আছে পান্না সবুজ কত দ্বীপ।

প্যারিস থেকে ক্যারিবিয়ান এয়ারলাইনস এর চার্টার্ড উড়োজাহাজ যাত্রীভর্তি। আমাদের সামনের আসনে শিশুদের কলকাকলি আর চ্যাঁ ভ্যাঁ। ঠিকই আছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ইউরোপিয়ানদের রৌদ্রমুখী দৌড়। সব শিশুদের কোলে নিয়ে বসতে হয়েছে বাবা-মা-দের। চার্টার্ড প্লেন বলেই নাকি। এই নিয়ে বেশ অসন্তোষের গুঞ্জন চলছে। একটু পরে দেখি মাথায় টুপটাপ জল পড়ছে। ভাবলাম তাই তো, চার্টার্ড জাহাজ এরকমই হবে। স্টুয়ার্ডকে ডেকে বললাম জল পড়াটা কি স্বাভাবিক ! উড়োজাহাজ ততক্ষণে ডানা মেলেছে আকাশে। গোল চাঁদপানা মুখের স্টুয়ার্ডটির মুখের একটি রেখাও কাঁপল না। বলে উঠল "হ্যাঁ স্বাভাবিক"। ভাবলাম তা হলে ভিজতেই হবে। বরুণ দেবতার কৃপা বর্ষাক আমার মাথায়, আমার আসনে। করিডর ধরে হেঁটে ফিরে আসছি, দেখি সেই চাঁদবাবু আমার সিটের ওপর উঁচু বদ্ধ তাক থেকে শিশুর দুধের বোতল থেকে গড়িয়ে পড়া দুধে ভেজা সিট ও তার চারপাশ মুছে চলেছে। সে কি সযত্ন মোছামুছি। "স্বাভাবিক "। প্যারিস থেকে ন ঘন্টার পথ। অর্ধেক পথ ঘুমিয়েই কাটল। এবার নামার পালা। আমরা জানলার ধারের সিট পাইনি। অথচ সম্পাদক বলে দিয়েছিলেন নামার আগে ওপর থেকে টুক করে একটা ছবি তুলে নিতে। এর জানলা ওর জানলা খুঁজছি। তখনও মেঘ, আলো আর নীল আকাশ। আমার সঙ্গে আরও এক তৃষিতা ফরাসিনী খুঁজে ফিরছে নিচের দ্বীপটি। এই প্রথম সে কোনও দ্বীপে বেড়াতে এসেছে। আমরা একসঙ্গে একেবারে সামনের দিকের জানলায় এগিয়ে গেলাম। এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ জম্পেশ করে ওয়াইন পান করছেন। জানলার দিকে নজরই নেই। ফরাসী মহিলা " সিল ভু প্লে - প্লিজ " বলতেই ঝপ করে ক্রিম রঙের ট্রাউজার্সে পড়ল সবটা রক্তিম পানীয়। বেশ খারাপ গালাগালি দিলেন। আমি ভাগ্যিস পেছনে। অপরিচিতাকে বললাম পালাও। তবু কি তৃষ্ণা মেটে ! আর একটি কোণের জানলায় অপেক্ষা করছি। জল আর জল। বিমানসেবিকা সস্নেহ ধমক দিয়ে বসতে বলল। পাঁচ মিনিটের দাক্ষিণ্যভিক্ষা। সেই মুহূর্তে উড়োজাহাজ ঘুড়ির মতো বেঁকে দেখাল দ্বীপের মুখ। জোড়া দ্বীপ, জল ছুঁয়ে জঙ্গল। দমিনিকান রিপাবলিক আর হাইতি। ছবি তোলার সুযোগ এল না। তার আগেই বাঁধন বন্দি। বিমানবন্দর পোর্তো প্লাতা। নামলাম। এগোচ্ছি, শুনলাম কৃষ্ণকলি মেয়েরা ফিসফিস করে বলছে " হিন্দু হিন্দু " - কপালে টিপ থাকলে শুনতেই হবে। পঁচিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা। এখন দুপুর। আকাশে ঘন কালো সজল মেঘ। যে কোনও সময় বৃষ্টি আসতে পারে। চারদিকে নারকেল গাছের সারি, শিরীষের পাতা ঝালরের মতো হাওয়ায় দুলছে। গোলেতা বিচ হোটেলের বাস আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে। ফরাসিনী লিডিয়া এই দলের নেত্রী। আমাদের গোলেতা বিচ হোটেলে নিতে এসেছেন। বেশ লাগছে। দূরে আখের খেত সবুজে সবুজ। আকাশে বাতাশে মানুষজনদের ব্যবহারে একটা আলসেমি মাখা সহজ হাওয়া বাতাস। হাতেহাতে হোটেলের নাম লেখা সবুজ রঙের ফিতে বাঁধা হল। এখন থেকে এটাই আমাদের পরিচয়। আখের বনে পাতা হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যায় এমন দূরত্বে। ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছেরা লাল টুকটুকে ফুলে সেজে আছে। আছে হলুদবসন্ত ফুলের গাছ। পথে যেতে যেতে চোখে পড়ে লেখা আখে বিয়াঁভেনিদস - স্প্যানিশ ভাষায় সাদর অভ্যর্থনা ব্রাণী। পথের বাঁ পাশে উথাল পাথাল সাগরের ঢেউ আর ডানদিকে পাহাড় উঠে গেছে অনেক উঁচুতে, ঘন বন। গোলেতা বিচ হোটেলটি নতুন তৈরি হয়েছে বেশ নামি-দামি দুটি সৈকত শহরের মাঝখানে - সুসা আর কাবারেতা।

বেশ চমৎকার তিনতারার হোটেল। নামতেই রাম মেশানো ফ্রুট পাঞ্চ হাতে হাতে, জিনিসপত্র পৌঁছে দিল ওপরে। ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, পাখাও আছে। সমুদ্র স্নানের জন্যে এখানে পেরোতে হয় একটি হাইওয়ে। সাঁ সাঁ করে গাড়ি চলে যায়, সাবধানে পার হওয়া। একটা সবুজ রঙের কাঠের দরজা খুলে ঢুকলেই অন্য জগত। ডুমুর শিরীষ ঝাউয়ের সারি, বনজ জঙ্গল হাত দিয়ে

সরিয়ে থামতেই দেখি বালিয়াড়ির নিচে আটলান্টিকের নীল। সাদা বালির সৈকত দূর দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে। আর সামনে পারাপারহীন অনন্ত সমুদ্র। ঢেউয়ের গর্জিত এগিয়ে আসা দেখে বুঝতে পারলাম লম্ফ-ঝম্প যতটা হবে সন্তরণ ততটা নয়। দু চারবার জলে গড়াগড়ি খাওয়া হল। এখন দেখছি নানা রঙের ঘুড়ি উড়ছে আকাশে। ঘুড়ি স্কেটিংয়ের জন্যে এই সৈকতটির নাম আছে। সন্ধেয় হোটেলে ডিনার। বুফে যেমন হয়। নানা খাবারের মধ্যে গরম রুটির ভেতর মাংসকুচি, চিংড়ি, চিজ, নারকোল কোরা ভর্তি করে জড়িয়ে সেঁকে দিল তাওয়ায়। খুব স্বাদ।

ভোরে একটা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। টানা শিস দিয়ে চলেছে পাশের বনের আলামান্দা গাছের ডালে বসে। তাড়াতাড়ি সমুদ্র সৈকতে হাঁটব বলে বেরিয়ে পড়েছি। বিকাশ গেছেন কাবারেট শহরটা দেখার জন্যে। বেলাভূমি নির্জন। ঢেউয়ের ফেনার মুকুটে সূর্যের আলো পড়েছে। অনন্ত নির্জনতা। ঢেউয়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। জলে পায়ের পাতা ছুঁয়ে হাঁটছি হাঁটছি-ঘুড়ি ক্লাব থেকে একটি ছেলে ও মেয়ে জলে নামল। অনেকক্ষণ পর ভাবলাম এবার ফিরতে হবে। রাস্তা গেছে গুলিয়ে। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে এক-একটি হোটেলের পথ উপরে উঠে গেছে। খুঁজে পাচ্ছি না আমাদের হোটেলে ওঠার রাস্তাটা। অনেকটা হাঁটার পর একটা চওড়া বালিপথ ধরে উঠে দেখি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বেরোবার পথ ঘেরা। এক জায়গায় কেউ তার কেটে রেখেছে। কোনওরকমে বেরোতে পারলাম। দেখি এ তো এক অন্য শহরে এসে গেছি। সুসা শহর যেখানে লিডিয়া বারবার একা যেতে নিষেধ করেছিল। পথের ধারে একটি ফলসবজির দোকানে ভাঙা স্প্যানিশে জিজ্ঞেস করি। ভুরু কপালে তুলে বলে " গোলেতা ! সে তো বেশ দুর। " আমার আকুল প্রশ্ন " কতটা হবে ! " " তিন-চার কিলোমিটার তো বটেই। " কাটা তালগাছের গুঁড়ির ওপর বসা নাদুস নুদুস প্রৌঢ় বলে উঠল " একটা মটো পঞ্চো নিয়ে চলে যাও না ! " তা হল এখানকার মোটরবাইক যার পেছনে যাত্রীরা উঠতে পারে। আমার কাছে না পরিচয়পত্র না পয়সাকড়ি। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটি কালো মেয়ে বলে উঠল "ফরাসী জান ?" ওরে বাবা বাঁচোয়া রে। ভাগ্যিস শিখেছিলাম। বলল, " একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও। হোটেলে গিয়ে পয়সা দিয়ে দিও। " ইতিমধ্যে দেখি স্কুলের নাম লেখা একটি গাড়ি আসছে। হাত তুলে থামালাম। " গোলেতা বিচ হোটেল কতদূর ! " আরে দশমিনিটের পথ - "পোর ফাবর - প্লিজ আমাকে একটু নামিয়ে দিন। পয়সা কাছে নেই। বিদেশিনী বলে অনুগ্রহ করুন। " ততক্ষণে আমি দরজার হ্যান্ডেল খুলে বসে গেছি লাল সাদা ইউনিফর্ম পরা কিশোরী মেয়েটির পাশে। দ্রুত গতিতে গাড়ি হোটেল ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রায়। " থাম থাম, এখানে নামব। " গলদঘর্ম হয়ে হোটেলে এসে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটা মিনি অ্যাডভেঞ্চার হল বটে। পরদিন ভোর ছটায় উঠতে হল। জিপ সফর পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে। দুটি গাড়ি চালাবে ট্যুরিস্ট চালকেরা, আমাদের গাড়ি চালাবে এক্সট্রিম অ্যাডভেঞ্চার কোম্পানির মালিক ফ্রেদেরিকো। ওর নিজের গাড়ি। লাল গাড়ি চালাচ্ছেন পর্তুরিকোর দিয়েগো, দু-সন্তানের জনক। বউ নিদিয়া মিষ্টি দেখতে। ছাই রঙের জিপে চারটি ফরাসি তরুণ তরুণী। কোনও রাস্তা নেই। ঝাঁকুনি দিয়ে পাথর টপকে গাড়ি চলেছে পাহাড়ি এখড়ো-বেখড়ো পথ দিয়ে। লাল কালো রঙের মাটি। সুসা গাঁ পেরিয়ে ওপরে ওঠা। মন্তেলেদা এসে বিখ্যাত বিয়ার প্রেসিদনতে অথবা রাম পাঞ্চ। দারচিনি মেশানো কফি সবশেষে। পরিবারের ছবি তোলা হল উপরিপাওনা।

আবার জিপে ওঠা। নিচে পড়ে থাকা ঘন জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে গাইড জানাল স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্ক ছবিটির শুটিং এখানেই হয়েছিল। ততক্ষণে পৌঁছে গেছি ইয়সিকা নদীর ধারে। গোরু-বাছুর চান করছে। নির্জন প্রকৃতি কী শান্ত। হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দে পেছন ফিরে দেখি জেব্রা দাগ কাটা বিশাল একটি ট্রাক ভ্রমণ-বিলাসীদের নিয়ে নদী পেরিয়ে চলে গেল। এত দ্রুত যে সমঝাবার আগেই দেখি আমাদের গাড়িও জলে নেমেছে, ধীর গতিতে ওপারে পৌঁছানো গেল। নদীর জলও গভীর নীল। চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গল ঘিরে রেখেছে, সেইখানে তার একলা চান। এবার এলাম চোরোস গাঁয়ে। সেখানে নদীটির নাম লসতুলিয়া - গোপনে তার নাম দিলাম লবটুলিয়া। এককোণে পাথরের দেওয়াল উঠে গেছে ওপরে - অনেকে চান করছে আমাদের মধ্যে।

একটি ছেলে পাথরের খাঁজখাঁজে হাত দিয়ে সেই উঁচুতে উঠে ঝাঁপ দিল জলে। সজোর করতালি আমাদের। আগুয়া মোচার অভিজ্ঞতা মনে থাকবে। এরপর কত আখের খেত, গুয়াজিতো নদী, মাদ্রে ভিয়েইয়া গাঁ, বেলা ভিসতা হাফশহর, লয়রইও বন পেরিয়ে চলেছি। চোখের তেষ্টা মেটে না এ দ্বীপের নীলসবুজ সৌন্দর্যে। কোকা বনের ঘন জঙ্গল। কোকা এদেশের অন্যতম প্রধান ইকনমি। খেতের মালিক যে মালিকানা তার। সরকারের নয়। পাহাড়ি বৃষ্টি নামল কী তোড়ে ! কাসা দেল হেরেবো পেরোচ্ছি, আর একটু উঠলেই পাহাড়ের চূড়া। কোকা বনের মাটি ধুইয়ে গেরুয়া জল সর্পিল নদীর মতো নেমে আসছে। ঠিক করা হল আর ওঠা নয়। কোকার জঙ্গলে তিনখানা গাড়ি কাদায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। ফরাসী তরুণদের খোলা জিপটি কাদায় পুঁতে যাচ্ছে। এদোয়ার আর পর্তুরিকান ভদ্রলোক গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে কাদা থেকে টেনে তুললেন।

পাহাড় থেকে নামছি। এত বৃষ্টির পর কাঁচা মাটিতে জল জমে বিপজ্জনক পথ। গাড়ি ঘুরছে ফিরছে। এঁটেল কাদায় কখনও আটকে যাচ্ছে। বৃষ্টি কোকার বন ধুইয়ে টুপটাপ আওয়াজে কী সিম্ফনি। অনেকটা ওপরে উঠে নিচে নামা হল। ভাগ্যিস। একটু পরেই পাহাড়চুড়োয় ধস নেমেছে খবর পাওয়া গেল। খানিকটা পিচ রাস্তা পরে আবার সেই এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে জঙ্গলের সুড়ঙ্গ পথ চলা। অনেক শহর গ্রাম পেরোলাম। এখন সুসাতো এসেছি একটি এ দেশের বাড়ি দেখতে। পর্ণকুটির। ঢুকেই রান্নাঘর। কাছের উনুনেই রান্না হয়, গ্যাসের সিলিন্ডার আছে ফ্রিজ চালাবার জন্যে। দিদিমা ফুটফুটে নাতনিকে কোলে নিয়ে বসে। পাশে মা ও তার মামাতো বোন। মুরগি চরছে। একটা নাদুস নাদুস শুকর গোলাপি রঙের আরামে ঘুমোচ্ছে। ওর নাম লা বেল্লা অতি সুন্দরি। ছবি তোলা হল। বসার ঘর শোয়ার ঘর দেখা হল। পাশেই খড়ের চালায় এক কিশোর

অপেক্ষায় আছে যুযুদ্ধমান অন্ধ দুই মোরগের লড়াই দেখানোর জন্যে। কলাগাছের ইতিহাস শোনাচ্ছে এদোয়ার। বাইরে উঠোনে ফরাসিদের কাছে। আমরা ওকে শেখালাম থোড়ের ঘণ্টর কথা। তালগাছের ভেতরে সাদা অংশ ইউরোপেও খায়-তালহৃদয় স্যালাডে আমরাও প্যারিসে খাই। থোড়ের ব্যবসা করতে বললাম তাকে। এবার ফেরা। হোটেলে নেমে লিডিয়ার সঙ্গে ছবি তোলা হল। ততক্ষণে সন্ধে নেমে গেছে। খাওয়ার আগে ছাদে গেলাম। অন্ধকার জঙ্গল। ঝিঁঝিঁর সচকিত ঝিল্লি ছাড়া কোনও শব্দ নেই। সামনেই পূর্ণিমা। প্রায় গোল চাঁদ অন্ধকারে উজ্জ্বল। সপ্তর্ষি মণ্ডল চোখের সামনে। পরিবেশ দূষণ নেই, জনতার কোলাহল নেই, এ এক অন্য কোথাও। নিচে খাওয়া-দাওয়া হল। মেরেনগে নাচের আসর আজ হোটেলে। বাজনা বেজে উঠেছে। দ্বীপের আদিম বন্য নাচ। এদের জাতীয় নৃত্য বলা যেতে পারে। নাচে শিহরণ মাখা যৌন আবেদন। গানেও। এখানে বলা হয় ঠাকুমা দিদিমারাও এ গানের ছন্দে বাচ্চাকে দোল দেয়। ছেলেমেয়েরা নাচছে যেন হাড়ের বদলে রাবার শরীরে এমন বাঁক আর সর্পিল ঘুরে চলা। ভারী সুন্দর লাগছিল। ঘুম পেয়ে যাওয়াতে উঠতে হল। তখন গিটারের ঝমঝমনি আর ড্রামের আওয়াজে নাচছে প্রেমের গানের সঙ্গে বাচাতা নাচ। গানে দুঃখের সুর। কিছু একটা হারিয়ে যাওয়ার আর্তি।

আজ আমরা পোর্তে পুনতোর টিকেট কিনতে কাবারেট গেলাম। হোটেলের লিডিয়া নাকি পয়সা বেশি নেয় মুখে মুখে এরকম কথা হোটেলে ছড়িয়ে যায়। লারা বলল যাবে নাকি ফান টুরে কম পয়সায় ! নিশ্চয়। হোটেল থেকে গাড়ি ছাড়ে একটার সময় কাবেরেট শহরের দিকে। ঠিক হল ওইখানে লারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। অতত্রব টিকেট কাটা হল অর্ধেক দামে। এখন আমরা একটি ট্যাক্সির সঙ্গে দরদাম করে ঠিক করলাম সময় আছে রাতে। যেখানে কলম্বাস জাহাজ ভাসিয়ে এ দ্বীপে নামেন আর স্পেনের রানির নামে ডাকেন ইসাবেলা সেই জায়গাটি দেখে আসা যাক। ট্যাক্সিচালক খুব দরাদরি করছে। ও বলে ষাট ডলার আমরা বলি কুড়ি। এখানকার কারেন্সি পেসো। পনেরো পেসোতে এক ডলার। কাজেই দরাদরি করতেই হয়। লারাকে সঙ্গে নিলাম। বেয়রুটের মেয়ে লারা, আছে ফরাসি দেশে। পাইপলাইন ব্যাংকে কাজ করে। আট বছরের ছেলেকে একা হাতে মানুষ করছে চার বছর হল। ভূতপূর্ব স্বামী ছেলের খবরও রাখেন না। পেশায় ডাক্তার। চারচারটি মার্সিডিজ গাড়ির মালিক যদিও। বিয়ের পর মারধোর করত নাকি লারাকে। বয়সের তফাতও অনেক ছিল। কয়েকটি বছর কেটে গেছে। বেয়রুটে মাকে ফোন করলেই বলেন " কি রে কারোর দেখা পেলি ! ভাবসাব হল ! " তাই বেয়রুটেও যায় না। এ সব ভুলে ক্ষণবিশ্রাম ও একটা অচেনা জগতে নিঃশ্বাস নিতে এসেছে সে। লেবাননের ধনী পরিবারের মেয়েটির বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। একটু পৃথুলা কিন্তু দেখতে ভাল। চটক ও বুদ্ধিমত্তা দুটোই আছে। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছিল। কাবারেট থেকেই গাড়ি ছাড়ল। এলাম সুন্দর শহর লুপেরঁ। এখান থেকে ছোট ছোট বোট যায় মিয়ামি, ফ্লোরিডা পর্তুরিকো। দূরে পাহাড়ের ওপর সমুদ্রের কোলে দেখা যাচ্ছে ইসাবেলা। কুলেব্রাঁ গাঁ পেরোতেই সাইনবোর্ডে লেখা ইসাবেলা মিউজিয়ম। কলম্বাস এখানেই থেমেছিলেন তিনটি জাহাজ ভাসিয়ে আটলান্টিক সমুদ্রপথে। সান্তা মারিয়া জাহাজটি হাইতির কাছে ডুবে যায়। দুটি জাহাজ থামে। জায়গাটি খুব মনে ধরে অনেক কারণে - আদিবাসী তাইনোরা শান্তিপ্রিয়, সহজেই জয় করা যাবে, নদী ভর্তি সোনার গুঁড়ো, তাইনো দলপতিদের গলায় ঝকঝক করছে সোনার গয়না। লোহার ব্যবহার জানে না, জানে না আধুনিক যুদ্ধধারা। কাজেই সহজেই এদের জয় করে দ্বীপদখল আর স্বর্ণশ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানো যাবে।

দ্বীপটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নাম দিলেন পুয়েরতো প্লাতা - রূপোবন্দর। সীমানার ভেতরে কলম্বাস গড়ে তুললেন আমেরিকার প্রথম ইউরোপিয়ান শহর ইসাবেলা ১৪৯৩ সালে। তাইনো ইন্ডিয়ানদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার। একেবারে নির্মম হাতে নির্দোষ প্রাণের বলি। রক্তের নদী বয়ে যায় ইসাবেলায়। সামনে ফ্ল্যামবয়েন্ট ফুলের গাছটি যেন ওদের রক্তে রাঙা হয়ে এত লাল ফুল ফুটিয়েছে। ইসাবেলা ন্যাশনাল মিউজিয়মে ঢুকছি। ঝাউ গাছে ঘেরা। দু-একটি ওয়াদুকান গাছ যা তাইনোরা পুজো করত, আসবাবপত্র তৈরি করত। এখন এ গাছে হাত দেওয়া নিষিদ্ধ। একটি ছোট মিউজিয়মে ঢুকলাম। কলম্বাসের বাড়ির থাম, বাসনকোসন, তাইনোদের অস্ত্রশস্ত্র, এ সব টুকিটাকি দিয়ে সাজানো। ছেলেটি যতটা পারল বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করল।

মুশকিলে ফেলল লারার হাসি। গাছে একজোড়া খুদে ঈগল দেখিয়ে গাইড বলছে ওরা কোকিল - কুহু কুহু - শিস দিয়ে লারাকে যত প্রমাণ করানোর চেষ্টা করছে সে খিলখিল করে হেসে উঠছে। কাছেই সমুদ্রের জলে হাওয়া ঢেউ তুলেছে - লারার হাসি ছাপিয়ে আমার কানে ভেসে এল সুন্দরী তামা রঙের তাইনো রাজকুমারীর কান্না। একটু দূরে কতদিন আগে কলম্বাসের সৈন্যবাহিনী খুনের রক্ত বইয়ে দিয়েছে এখানেই। এগিয়ে আটচালা ঘরের ভেতরে দাঁড়ালাম - চারদিক খোলা। অনেক নিচে সাদা ফেনা লাফিয়ে তীর ছুঁয়ে দিচ্ছে। চারদিকে তাইনোদের অনাদৃত কবর, স্প্যানিশ কবরের ওপর সাদা ক্রস রাখা। ওপারে হাইতির পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বেলা গড়িয়ে এল। আমরা ফিরে চলেছি। পুয়েরতো প্লাতা তার একাকিত্ব নিয়ে অনেক দূরে। ভোর ছটায় উঠে বাস নিলাম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। পুয়েরতো পুনতো চলেছি। লারা পাশেই বসেছিল। গল্প করে ঘুমিয়ে বাইরের নীল আকাশ লাল করবী ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছের আকাশ ছড়িয়ে আবির রঙ ঢালা, লোকজন পথে ফল সবজির পসরা নিয়ে বসে এই সব দেখতে দেখতে তিন ঘন্টার রাস্তা কেটে গেল। বাস এল সমুদ্রের ধারে। আমার ছুটির বন্ধু লারাকে খুব পছন্দ তার। নানাভাবে বিরক্ত করে আরক্ত করে দিচ্ছে প্রায়। স্পিডবোটে চড়ে সমুদ্র পাড়ি এখন। সেও তিনঘন্টা হবে। আমরা পনেরো জন যাত্রী। বেশ লাগছিল। নীল অগাধ সমুদ্র কেটে ছোটা। মজাটা পরে টের পেলাম। ঢেউয়ের ফণায় এই উঠছে এই নামছে ছাউনিহীন বোট। হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়। সভয় চিৎকার ছাড়া কেউ কোনও কথা বলছে না। এ ভাবে এলাম প্রবাল দ্বীপে। হোগলার ছাউনি তিন-চারটি। বাচ্চারা দৌড়ে আসছে। কোথায় থাকে এরা ! দূরে প্রবালপ্রাচীর। পেরিয়ে যাওয়া মানা ছিল গাইডের।

চোখে চশমা মুখে মুখোশ সব কিছু নিয়ে তৈরি হয়ে অনেকে এগিয়ে চলেছে তবু। আমার পায়ে বিশাল রাবারের চটি। ফ্লিপ ফ্লিপ। তারপর ঝপাং ঝাঁপ। জলে চোখ ডোবাতেই কি সম্পদ অপেক্ষা করছিল। আর একটু হলেই প্রবাল পাথরে ধাক্কা খেতাম। চারদিক ঘিরে রঙিন মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রবালের ঝোপ দেখলে ভয় ভালবাসা দুইই হয়। অন্ধকার।

ওপর থেকে আলো পড়ছে। একটু ভুতুড়ে বইকি কিন্তু স্বর্গীয়। হাতে চটকানো কলা। অন্য হাতে জল ক্যামেরা। কলার সদগতি তক্ষুনি হয়ে গেল। মাছেরা হাত থেকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ক্যামেরা সামলাব না ঢেউ এই ভাবতে ভাবতে কোনও ছবিই হয়তো উঠল না। বড় একটা সাদায় কালোয় মাছ বেশ কাছে এসে দেখছে। পারলে ওর হাতেই ক্যামেরাটা ধরিয়ে দিতাম। পনেরোটা ডলার বৃথা গেল বোধহয়। অন্তহীন নীল সমুদ্র, চোখের নিচে প্রবালের রঙিন ঐশ্বর্য, মাছেদের ঘুরপাক সব ভুলিয়ে দিল। শুধু পায়ের মৎস্যকন্যার মতো চটি জোড়া বড়োই বিরক্ত করছে। নিচু হয়ে খুলে ফেলব তার উপায় নেই। তা হলেই জলে ডুব, প্রবাল পাথরে ধাক্কা খাওয়া। ভুলে গিয়ে দেখে চললাম মাছেদের খেলা। মাঝে মাঝে জল পেরিয়ে তীরে আসা আর লেবুর টুকরো, প্যাশন ফল এ সবের স্বাদ নেওয়া। ফ্রুট পাঞ্চ তো ঢুকঢুক চলছেই। আড়াই ঘন্টা কাটল জলে।

এবার ফেরা। ওই নির্জন প্রবাল দ্বীপের সাদা বালির সৈকত, পান্না রঙের জল, প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ঢেইয়ের সাদা ফেনা সব পেরিয়ে আবার সেই মাতাল তরণীতে আমরা। এবার চলেছি একটু আস্তে। ম্যানগ্রোভের জঙ্গল পাশে রেখে। গুঁড়িগুলি জলের তলা পর্যন্ত নেমে গেছে। কতদিন ধরে পড়ে আছে জলে জঙ্গল বানিয়ে। ত্রিনিদাদে কারিনা ম্যানগ্রোভ খালে নৌকায় গেছি। কিন্তু এরকম লাগেনি। মাথায় ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল লাল টুকটুকে পাখিরা, গাছের মাথায় কুন্ডলি পাকানো সাপ, দূরে মানুষের কুঁড়েঘর বাড়ি। এখানে সবকিছু প্রবল প্রবাল নির্জন। ঘন সবুজ বনে একটি প্রাণীও নেই। শুধু লাল কাঁকড়ারা গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে। আর উবসাঁ, ঝিনুকের মতো অথচ ঝিনুক নয়। ম্যাথুর হাতে ক্যামেরা দিলাম। কী তুলেছে পরে দেখা যাবে।

ঘুরে গেছে জঙ্গল। বেরিয়েই বোটের আবার সেই ছোটা। ঢেউ ছিটকে নৌকায় আমাদের ভেজাচ্ছে। কখনও ঢেউয়ের মাথায় ওঠা কখনও নামা। অবতরণ বললেই হয়। আবার সেই তিনঘন্টার ছোটা জলের ওপর দিয়ে। কলম্বাস কী করে য়ে বারবার জাহাজ ভাসিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ভাবছিলাম। সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। লারা অন্য বোটে। পরস্পরের ছবি তুললাম। হাত নাড়ানো হল। এই মেয়েটিই পুনতো প্রবাল সৈকতে ম্যাথুর ডাকে সমুদ্রে যাওয়ার আহ্বানে সাড়া দিতে ভয় পেয়ে আমাকে সঙ্গিনী হতে বলেছিল। বলেছিলাম পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তোমার। বিয়ে ভেঙেছ, আট বছরের পুত্র মানুষ করছ, এতে ভয় পেলে চলবে কেন। সে গিয়েছিল। এখন ম্যাথুর কাতর দৃষ্টি অন্য বোটে লারার দিকে। কি করা। ঝাঁপ তো দিতে পারে না ! আমাদের মাতাল তরণী ছুটল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। অনন্ত আটলান্টিক। বাহির সমুদ্র। কলম্বাস এই পথ দিয়েই গিয়েছিলেন। সৈকতে এসে নামতেই অনেকের মাথা ঘুরছিল। এই ওঠা আবার ধপাস পড়া অনেকের সহ্য হয় না। তাছাড়া মাল দ্য ম্যার অর্থাৎ সমুদ্রপীড়া অনেকেরই আছে। একটা ঝুপড়ির মতো রেস্তোরাঁর নামখানি বাহারি - ফ্ল্যামবয়ান্ট ফুলের নামে নাম। বাসিন্দারা একটা লাল ফুলে ছাওয়া গাছের নিচে ছড়িয়ে বসেছে নানা পসরা - বিশাল বিশাল গোলাপি আভার শাঁখ, পুঁতির মালা, মুখোস এইসব। ছবি তুললাম। এখানে একটা সুবিধে আছে, ছবি তোলা যায় সহজেই মানুষজনের। একটি মা কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসেছিল তার খুকিকে নিয়ে। ছবি তোলাতে খুসির হাসি উপহার দিল। বাচ্চাটির হাতে লজেন্স দিলাম। ততক্ষণে ম্যাথুর ডাক " কমেমস সিনোরা, ভামনস " - টেবিল পাতা। ভাত, সাদা বিরাট মাছ আর ম্যানিয়াকের মন্ড। মিষ্টি আমের টুকরো শেষ পাতে।

আজ ভোর পাঁচটায় উঠেছি দ্বীপের রাজধানী সান্তা দমিনিকা দেখতে যাব। তিন ঘন্টার পাহাড়ি পথ। উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণে। বোনেরো পেরোলাম। ছবির মতো সমুদ্র সৈকত আরপাহাড়। মোকায় প্রাতরাশ, দেরি আছে। পথের সৌন্দর্য দেখা হল না। আধাপথ ক্লান্তির ঘুম। এখন মোকা শহরে জাকারান্ডা রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ। দু-কাপ কফি নিলাম ঘুম তাড়াতে। সান্তা দমিনিকাকে ডাকা হয় শ্রেষ্ঠ ছুটি কাটানোর শহর। আধুনিক কৃষ্টি ঠিকঠাক মিশে গেছে প্রাচীন লাতিন সভ্যতার সঙ্গে। আছে লাতিন ক্যারিজমা। আর ক্যারিবিয়ান সমুদ্র সৈকত। এ শহর " নতুন জগতে " প্রথম ইউরোপিয়ান বসতি। পশ্চিমী জগতের ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস এল এখানে - গড়ে উঠল প্রথম ক্যাথিড্রাল, প্রথম মঠ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল আর প্রথম বিচারভবন। কলম্বাস ও তাঁর ভাই বার্থোলমিও উত্তরের ইসাবেলা রাজধানী ছেড়ে দক্ষিণে নতুন রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন। ইসাবেলায় ম্যালেরিয়ার উপদ্রব, বহির্সমুদ্র থেকে আসা ঝড়ঝাপটা এড়াতে সরে এলেন। এসব ভেবেই গড়ে তুলেছিলেন নতুন রাজধানী দক্ষিণে। ইউনেস্কোর উত্তরাধিকার তালিকা ভুক্ত আজকের সান্তা দমিনগো। আমি অনেকের মতো ভুল করে ভাবতাম গোটা দ্বীপটির নামই বুঝি তাই। এখানে এসে ভুলটা ভেঙেছে। প্রথমই গেলাম লস ত্রেজ ওহোস তিন চোখের পার্ক দেখতে। ওজামা নদী বয়ে যাচ্ছে। তার খুব কাছে তিনটি গুহা। বিভিন্ন ধাপে নামা। নিচে পড়ে আছে নীল চোখের মতো মিষ্টি জলের হ্রদ। একটা তো আগ্নেয়গিরির গুহা, গন্ধকের জল। বলা হয় এর কোন তল নেই। স্ট্যালাকটিক আর স্ট্যালাগমাটিক পাথর ওপর থেকে ঝুলে আছে। তাইনোরা এখানে পুজো-আর্চা করত। এরপর গাড়ি থামল কলম্বাস লাইটহাউস স্মৃতিমিনারের কাছে। এই প্রাচীন শহরে ম্যামথের মতো একটা অতি আধুনিক দুশো এগারো মিটার দীর্ঘ প্রাসাদের মতো বাড়িটির পয়ঁতাল্লিস ডিগ্রি বাঁকিয়ে ক্রসের মতো তৈরি। আহামরি লাগেনি আমার। ১৯৯০ সালে কলম্বাসের এই নতুন জগতে প্রথম পদার্পণ পাঁচশো বছর পূর্ণ হওয়ায় তৈরি হয়েছিল। আমাদের বাসচালক সান্তিয়াগো বলল "জান তো আমরা বিশ্বাস করি কলম্বাসের মরদেহ এখানেই রাখা আছে। রাতে প্রচন্ড জোর আলো ফেলে আকাশে ক্রসটি আঁকা হয়ে যায়।

এরপর আর বাস যাবে না। পায়ে হেঁটে শহর দেখা। ঔপনিবেশিক সময়ের জগতে ঢুকে পড়া। নামও " কলোনিয়াল সিটি "। ঢোকার অগে দেখি পাথরের রাস্তার দুদিকে কাফেবার, ছোট ছোট হোটেল, রেস্তোরাঁ পুরানো সময়কে নতুনের সঙ্গে কী সুন্দর মিশিয়াছে। পার্ক দ্য কলম্বাস - রানি ইসাবেলার মূর্তিটি দৃপ্ত দাঁড়ানো। গেলাম কলম্বাসের ছেলে দিয়েগোর প্রসাদ দেখতে। ব্যালকনি থেকে দেখা যায় নদী। বিশাল লাল রঙের মালবাহী জাহাজ দাঁড়িয়ে। কলম্বাস কি জাহাজ ভাসিয়ে এখানে এসেছিলেন ! ভেতরে দেওয়ালে অনেক পুরোনো ছবি। তার মধ্যে রানি ইসাবেলার ছবিটা ঘরের যেখানেই দাঁড়াবেন আপনার দিকেই তাকিয়ে আছেন এ রকম মনে হবে। কলম্বাস ছেলে দিয়েগোকে নিয়ে দৃপ্ত দাঁড়িয়ে। গাইড জানাল কলম্বাসকে যে যেমন বর্ণনা দিয়েছে সে রকমই এঁকেছেন চিত্রকর। কারণ কলম্বাস নাকি নিজের ছবি আঁকতে দেননি কাউকেই। আমি টুক করে একটা ছবি তুলে নিলাম।

শহরের সবথেকে পুরোনো রাস্তা লাস দামাস ধরে চলেছি সান্তা মারিয়া গির্জা দেখতে। ভেতরে গথিক আর রেনেশাঁস মেলানো খিলাম, বেদি, দেওয়ালের জালি কাজ, ফ্রেস্কো - সমবেত প্রার্থনা গান চলছে আভে মারিয়া - এখন চলেছি বাসে শহর দেখতে দেখতে একটি রেস্তোরাঁতে খেতে। এবার ফেরার পালা। গাড়ি ছুঁটছে কদের্দলিয়ের পাহাড়ের গা দিয়ে। এত উঁচু যে নিচে তাকাতে ভয়ে করে। অথচ নিচে গাছপালা, খেত, ফুল, ছোটছোট কুটির, বারান্দায় বসা মানুষদের গড়িয়ে আসা বিকেলের আড্ডা তাও দেখতে সাধ যায়। পুয়েরতো প্লাতার দিকে ফিরে চলেছি।

আজ বিকেলে হোটেল ছাড়ব। সন্ধেয় প্লেন। প্যারিসে শুনছি বৃষ্টি পড়ছে। এখন দুপুর। অনেকেই সুইমিং পুলের কাছে বসে গল্প করছে। আমি একটা করবী গাছের তলায় বসে ভাবছিলাম এখানকার আদিবাসী তাইনোদের কথা। কি উত্তরাধিকার রেখে যেতে পেরেছে তাদের আপন দ্বীপে ! গুহায় আঁকা কিছু ছবি,যা কপি করে চড়া দামে বিক্রি করছে আজকের মানুষ ট্যুরিস্টদের কাছে। আর পড়ে আছে গাঁয়ের নামগুলিতে - আমিনা, বানি, বাও, বোনাও, কুতুপু, দামাজগুয়া, মাগুয়া, মাগুয়ানা, সামানা আরও কয়েকটি। অনেক নদীর নামগুলিও তাইনো - হায়না, ওজামা, সোসুয়া, তিয়েরো ইয়াকে। এখানে অনেক গাছ ও ফলের নাম প্রাচীন ভাষার - আনাকাজুইতা, কাজুল, কাওবা সেইবা গুয়ইয়াবা গুয়ানাবানা - এরা পিঁপড়েকে ডাকে এখনও বিবিজাগুয়া, উইপোকা কমেজেন, কারে সাগর কচ্ছপ -। গাঁয়ে ঘরে কাউকে জায়গার দূরত্ব জিজ্ঞেস করলে বলে আলি মিসমো, এখানেই। পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টাও করবেন না, আট দশ কিলোমিটার হবে। অ্যাঁ চিন - একটু, অ্যাঁ চিনচিন এই একটু উনা রিনবা অনেক দূর। হোটেলে নাচের মেয়েটির নাম তাইনো ভাষায়, আকিনিনা - তার গায়ের রং উজ্জ্বল তামার বাসনের মতো, একঢাল কালো চুল। আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছিল। ভাঙা ফরাসিতে সে কথা বলত। মেরেনহো নাচে তার দেহভঙ্গি দেখার মতো। এখন আমার পাশে বসে ফ্রুটপাঞ্চে চুমুক দিচ্ছে। মনে পড়ল অনেকদিন আগে এ দ্বীপের রাজকুমারীর কথা। রাজা বোহেচিও খুন হলেন স্প্যানিশদের হাতে। তাঁর বোন সুন্দরী বুদ্ধিমতী আনাকাওনা কাওনাবো ক্ষমতা হাতে নিলেন। রক্ষা করতে পারেননি প্রজাদের। ১৫০৩ সালে রাজকুমারীর চোখের সামনে হাজার হাজার মানুষের রক্ত গড়িয়ে গেল জারাগুয়া শহরের মাটিতে। ইতিহাসে ডাকা হয় জারাগুয়ার রক্তমাখা গণহত্যা। তিনি বন্দিনী। শেষ কথা মৃত্যুর আগে - " ধিক এই গণহত্যা, লজ্জাহীন হিংসার তান্ডব ; এস আমরা একটা ভালোবাসার সেতু গড়ে তুলি। আমাদের শত্রুরা পেরোতে গিয়ে পায়ের কলঙ্ক ছাপ রেখে যাবে সকলের স্মৃতিতে। " এ ছবিটা তোলা যায় না। ভাবায়। প্যারিসে ফিরে এসেও ভাবাচ্ছে।

প্যারিস, ১৪ জুলাই

বাস্তিল দিবস, ২০০৪